Belles-Lettre 2024, Vol. 2, pp. 144-157

নিঃসঙ্গ প্রেম বনাম পোস্ট-পার্টিশন ডায়াস্পোরা : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘গাছ’

অর্পণ রায়চৌধুরী

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ‘দ্বাদশ রবি’ রবীন্দ্রনাথ যখন বিপুল সাহিত্য-কিরণসম্পাতে সমস্ত আকাশ অধিকার করে আছেন, ঠিক তখনই রবীন্দ্রানুরাগী, রবীন্দ্রবিরোধী দলের নতুন পালক হিসেবে উপস্থিত হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯.০৯.১৯০৩-২৯.০১.১৯৭৬)। পিতা রাজকুমার সেনগুপ্ত ও মাতা হেমলতা দেবীর পঞ্চমগর্ভ ছিলেন তিনি। পিতা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর পালং থানার অন্তর্গত দাসার্তা গ্রামের বাসিন্দা আর নোয়াখালিজেলার সদরের আইন ব্যবসায়ী। সাউথ সুবার্বন কলেজে (যার বর্তমান নাম আশুতোষ কলেজ) পড়ার সময়ে তিনি অসংখ্য কবিতা লেখেন কিন্তু প্রকাশ পায়নি একটিও। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় পাঠানো লেখা, বারবার ‘রিজেক্টেড’ হয় পত্রিকার সহ-সম্পাদক প্যারীমোহন সেনগুপ্তের হাতে। শেষ পর্যন্ত কলেজ সহপাঠীর পরামর্শে ‘নীহারিকা দেবী’ ছদ্মনামে পাঠালে মনোনীত হয় সেই লেখা। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘প্রভাতে’ কবিতাটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। আর ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৪শে মাঘ ‘বিজলী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘রাত্রি’ কবিতাটি সম্ভবত ছদ্মনামে লেখা তাঁর শেষ কবিতা।[১] পরবর্তীকালে ১৯২২ সালে সহপাঠী প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে লিখেন ‘বাঁকালেখা’ উপন্যাসটি। এরপর ১৯২৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ‘বেদে’ উপন্যাস। এই বছরই, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে তিনি প্রথমবার ‘কুন্তলীন পুরস্কার’ লাভ করেন ‘তারপর’ গল্পটির জন্য। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দেও ‘বিদ্যুৎ’ গল্পটির জন্য ‘কুন্তলীন পুরস্কার’ পান তিনি। ১৯৩১ সালে বহরমপুর সদরে অস্থায়ী মুনসেফ হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করলেও দু’বছর পর হাওড়া আমতা যোগদান করেন এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে বদলি হয়ে চলে যান অবিভক্ত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায়। নেত্রকোণা, খুলনা হয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে ১৯৩৯ সালে পুনরায় বদলি হয়ে চলে আসেন মালদহ জেলার নবাবগঞ্জের চাপাই-তে। এরপর আর কখনো কর্মসূত্রে বদলি হয়ে যেতে হয়নি বাংলাদেশে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘নায়ক-নায়িকা’ গল্পটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। এর আগে ‘প্রাচী’ পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যায় ‘নীহারিকা দেবী’ ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ‘নর্দমা’ নামের একটি কথিকা গল্প।[২]

বিষয়বস্তুর নির্বাচন, ভাব প্রকাশের আঙ্গিক, উপস্থাপন রীতি অচিন্ত্যকুমারকে দিয়েছে এক অনন্য

আসন। কর্মক্ষেত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বারেবারে উঠে এসেছে তার গল্প ও উপন্যাসে। সাহিত্য, জীবন ও জীবন দর্শন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর লেখার মধ্যে। লেখাকে তিনি উপাসনা হিসেবে গ্রহণ করে, বাঁচতে চেয়েছেন লেখার মধ্য দিয়েই। মৌলিক রচনা কিংবা অনুবাদ রচনা সব ক্ষেত্রেই তার স্বকীয়তা বর্তমান। কালের পরম্পরায় মননের মধ্য দিয়ে তাঁর অবাধ বিচরণ পাঠককে নাড়িয়ে তোলে আজও।

দুই.

কিঞ্চিৎ বিস্ময়সহ উদ্ধার করা যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'গাছ' গল্পটি প্রকাশিত হয়নি কোনো পত্রিকায়। ১৩৭২ বঙ্গাব্দে 'আনন্দধারা' প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত 'শতগল্প' সংকলনে ২৬ সংখ্যক গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে 'গাছ' গল্পটি। বইতে গল্পটির রচনাকাল উল্লেখ করা হয়েছে ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। এই গল্পটির উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪১০ বঙ্গাব্দে 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'একশ এক গল্প' বইতে সপ্তম গল্প হিসেবে।

গল্পের চরিত্র হিসেবে গাছকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস একেবারে নতুন নয় বাংলা সাহিত্যে। ছোটগল্পের রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে 'বলাই' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উঠে আসতে পারে একটি গাছ। শৈশব থেকে কৈশোর চৌকাঠে পা ফেলার সময় পর্যন্ত বলাইয়ের প্রাণের দোসর ছিল একটি শিমুল গাছ। তুলো ছড়াবার ভয় আর ভবিষ্যৎ কল্পনা করে মামি কাটিয়ে ফেলে গাছটি। দাদুর কাছে বড় হওয়া এক শিশুর গাছের সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হওয়ার ঘটনার সাক্ষী রাস্কিন বন্ডের 'দ্য চেরি ট্রি' গল্পটি। জনৈক বাড়ির বড়বউয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বোঝাতে বনফুল বড়বউকে নিমগাছের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন 'নিমগাছ' গল্পে। নিমগাছ যেমন কবিরাজের সাথে চলে যেতে চেয়েও পারেনি ঠিক তেমনই বড়বউ সংসারের জ্বাল ঠেলে, বেরিয়ে আসতে পারেনি সংসার থেকে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গাছটা বলেছিল' গল্পে একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে গাছটি। মৃদুমন্দ বাতাসের সাথে দুলে ওঠা পাতায় মর্মর ধ্বনি উত্থিত হয়, তা যেন 'মর্ মর্' বলেছিল পাতাকুড়ানি বুড়িকে, দারোগাকে কিংবা গ্রামের যুবক ডাক্তারকে। যারা কেবল শুনতে পেয়েছিল তাদের মৃত্যু ছিল অনিবার্য। গল্পটি সংস্কার ও বিশ্বাসের মোড়কে থেকে কিছুটা ম্যাজিক রিয়ালিজমের আঙিনায় পৌঁছাতে পারে, তার বেশি নয়। জনপ্রিয় ওড়িয়া সাহিত্যিক রাজকিশোর পট্টনায়কের 'ফাঁকি' গল্পে দেখতে পাই একটি আমগাছকে কেন্দ্র করে গোপালের পদার্পণ ঘটেছে শৈশব থেকে কৈশোরে। ছোট-বড় পাতা, ডাল কিংবা ফলের বন্ধনে গাছটি মুড়ে রাখে গোপালদের পরিবারকে। গল্পে দেখা যায় গাছটি হয়ে উঠেছে গোপালদের বাড়ির অ্যাড্রেসিং আইডেন্টিটি। পরে গাছটি ভেঙ্গে পড়ে কেননা ভেতরে ভেতরে কাজটিকে উইপোকায় খেয়ে নিয়েছিল অর্থাৎ আম গাছ লাগানো থেকে শুরু করে ভেঙ্গে পড়ার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ আম গাছের গল্প দেখতে পাই যেখানে গাছটি একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের পাশাপাশি একটি নির্দেশ, একটি চিহ্ন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'গাছ' গল্পে দেখব গাছটি কীভাবে সামান্য উদ্ভিদ থেকে উন্নীত হয়েছে মনুষ্য স্তরে।

তিন.

'তারপরে রাত করে ঝড় উঠল'— 'গাছ' গল্পটা শুরু হয় বাক্যটি দিয়ে। অর্থাৎ 'তারপরে'-র পূর্বে কোনো না কোনো ঘটনা ঘটেছে নিশ্চিতভাবেই। সেই ঘটনার ইঙ্গিত বা পূর্বাভাস দিতে গিয়ে গল্পকার জানান—

> সন্ধে থেকেই মেঘ জমছিল, থমথমে হয়ে ছিল দিশপাশ। একটা গাছের পাতাও নড়ছিল না। কী যেন একটা ঘটবে তারই ভয়ে বোবা অন্ধকার তটস্থ হয়ে আছে। কান্নার সুরে দূরে একটা শেয়াল ডেকে উঠল বুঝি।[২]

সেই সন্ধ্যার রূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্য গল্পকার অচিন্ত্যকুমার দুটি ছবি শব্দচিত্রে এঁকেছেন সুন্দরভাবেই। এক. 'বোবা অন্ধকার তটস্থ হয়ে আছে'। দুই. 'কান্নার সুরে দূরে একটা শেয়াল ডেকে উঠল বুঝি'। আসলে অন্ধকার ভয়ের ঠিকই, অন্ধকার যদি কথা বলে অর্থাৎ জনমানবের আওয়াজ, পশুপাখির কলরব যদি অন্ধকার কেটে বেরিয়ে আসে, তবে সে অন্ধকার আর যাই হোক না কেন নখরদন্ত হয় না। কিন্তু যে অন্ধকার শান্ত সমুদ্রের মতো নীরব, যাকে গল্পকার 'বোবা' বিশেষণে অলংকৃত করেছেন সে অন্ধকার ক্ষুধিত হায়নার চেয়েও বীভৎস, ভয়ঙ্কর, হিংস্র। আসলে 'বোবা অন্ধকার' নীরবতার শব্দ দিয়েই প্রকাশ করে তার ভয়ঙ্কর হিংস্র রূপকে। এই থমথমে স্তব্ধতার পর সাইক্লিক ওয়েতে যে ঝড় আছড়ে পড়বে, তা রাত করে ঝড় ওঠার পুর্বেই কল্পনা করতে পেরেছিল মানুষগুলোও। আসলে এই ঝড় প্রকাশ্যে আসার পূর্বে গল্পকারের মনোজগতে যে কুজ্ঝটিকা বিস্তার করেছিল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঘরের বারান্দায় ঝড়ের প্রহর গোণায় ব্যস্ত লোকগুলি বলাবলি করছিল যে, 'ও শেয়াল নয়। শেয়াল কখনো একা ডাকে না। ডাকলেও এমনি কঁকানো কান্নার সুরে নয়'। অর্থাৎ এ ঘটনা যে অশুভ সংকেত তা বলা বাহুল্য। এখানে শেয়ার হল অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অনাগত ভবিষ্যতের এক একটি বিপদ, শঙ্কার ফাঁদ। আর এই শব্দের র‍্যাপারে লুকিয়ে থাকা সত্য হল মানুষই কঁকিয়ে উঠছে, শিউরে উঠছে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা ভবিষ্যতের বিপদ কল্পনা করে। মানুষের একলা চলার পথ নতুন নয়। দীর্ঘ পথ মানুষকে একাকী পাড়ি দিতে হয় কেবল মাঝে মাঝে সঙ্গদান করে ভিন্ন যাত্রাপথের নিঃসঙ্গ পথিক। যেমন সুভঙ্গকে সঙ্গ দান করেছিল মনোরথ বিবাহ-উত্তর জীবন পথে। গল্পে দেখা যায় এক প্রবল পরাক্রমি ঝড় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্ধকার হয়ে থাকা মানুষগুলোর উপর। এই ঝড়ের তাণ্ডবে গাছ উপড়ে পড়ছে নিমেষে। ঝড়ের তাণ্ডবে এ বাড়ির সিন্দুকও বাড়িতে হাজির হয় মুহূর্তেই।

স্ত্রী দেবুবালা, বড় মেয়ে গঙ্গামণি, বাড়িতে ছোট বোন গয়ামণিকে নিয়ে বাবা শম্ভুপদর সংসার। বাবা শম্ভুপদ শত চেষ্টা করেও উপযুক্ত পাত্রে সদ্গতি করতে পারেননি মেয়েকে। মেয়ে সুন্দরী

হলেও, যেহেতু সে বোবা তাই কেউ চায়নি তাকে বিয়ে করতে। ১৩৭১ বঙ্গাব্দ বা তার পূর্ববর্তী সময়ের নিরিখে সমাজে এই বিষয়টি স্বাভাবিক। বড় মেয়ে গঙ্গামণির মুখ ফুটবে— এই বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে বাবা শম্ভুপদ তার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ দেন একটি গাছের সঙ্গে। প্রতিবারের মতো কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের কাছে অনিবার্যভাবে এবারেও পরাজিত হয়েছে বিজ্ঞান। অর্থাৎ গঙ্গামণির 'না-বলা কথা' নীরবেই প্রোথিত থেকে যায় 'না-বলা কথা' হিসেবে। ছোটবেলার কৃত অভ্যাসাদি ছড়িয়ে পড়ে যৌবনেও। তার আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ঘটে শিশুসুলভ এক সরল চাপল্যের। 'ক্রনলজিক্যাল এজ' পরিবর্তিত হতে থাকলেও কোনো পরিবর্তন হয় না 'মেন্টাল এজ'-এর। এদিকে গঙ্গামণিদের পাশাপাশি এক বাড়িতে থাকে গঙ্গামণির 'সই' সুভঙ্গ ও তার স্বামী মনোরথ।

একদিন রাতের উদ্দাম ঝড় আর প্রচণ্ড বৃষ্টিতে পৃথিবী টলমল করছে কাকপক্ষী বাসায় বসে নিজেকে ও সন্তানকে রক্ষা করার কাজে মগ্ন তখন জানা যায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সুভঙ্গকে। শেষপর্যন্ত পাওয়া যায় গঙ্গামণিকে। বাগানের একটা গাছ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। সবাই এসে দেখে গঙ্গামণি তার স্বামীর আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে বলছে— 'না, না, না, তুমি যেও না, তুমি যেও না'। গঙ্গামণির আর কোনো স্পিকিং মুভমেন্ট লক্ষ্য করা যায় না এই গল্পে। আসলে এটি কোনো কথা বলার মুহূর্ত নয়, গঙ্গামণির আচরণের একটা শব্দসমন্বিত রূপ, তার আচরণকে একটা ভাষিক রূপদানের প্রচেষ্টামাত্র। এরপর কথক জানান গাছের সাথে গঙ্গামণির দিনযাপন আর রাতযাপনের কাহিনী। স্বামীর কাছে গঙ্গামণির মান-অভিমানের কথা। মনোরথ যে গঙ্গামণির প্রতি 'ভিন্নরূপ দৃষ্টিবর্ষণ' করে তা স্বামী-গাছকে জানাতে ভোলেনি সে। এইভাবে কাটতে কাটতে একদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে তাদের জীবনে। গঙ্গামণির মুখে কথা আনার জন্য ফিরিয়ে আনার জন্য নানারকম সাধ্য সাধনা করতে থাকে তার বাড়ির লোকজন। আর তাতে আগুনে ঘৃতাহুতির মতো নতুন নতুন ভাবনা যোগায়, বিভিন্ন রকম পরামর্শ দেয় মনোরথ। গঙ্গামণির বাড়ির পূর্ব দিকে থাকা তার স্বামী-গাছের ডাল কেটে ফেলে মনোরথ এবং তার যে প্রাণ ও প্রতিবাদের ভাষা আছে, তার মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব আছে তা প্রমাণ করার জন্য তার স্বামীর-গাছকে বার বার চাপ দিতে থাকে সে। গাছের ডাল কেটে বেদনার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় গঙ্গামণির মুখে ভাষা ফেরানোর। শেষপর্যন্ত মনোরথ পরামর্শ দেয় একটা ডাল কাটলে কিছু হবে না, কেটে ফেলতে হবে সম্পূর্ণ গাছটাই। মনোরথের মনোজগতের ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসা এই পরামর্শ উপযুক্তভাবে প্রয়োগ হওয়ার পূর্বেই ঝড় উঠলো আরেকটা। পূর্বের মতো প্রাকৃতিক বিপদ নয় এই ঝড়। এ বিপদ মনুষ্যকৃত। তাই মনুষ্যতার দ্বারা বিস্তৃতি। এই ঝড় দেশভাগজনিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার রক্ত-ঝড়। এই দাঙ্গার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সবাই একবস্ত্রে, একলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে নিজেদের বাঁচাতে। বাদ যায়নি শম্ভুপদদের গ্রামও। শান্তির নীড় খুঁজতে খুঁজতে তারা শেষমেষ পৌঁছে যায় সীমান্তে। এ

ভয়াবহ দাঙ্গায় প্রাণ হারায় সুভঙ্গের স্বামী মনোরথ। সীমান্তের অফিসার খোয়া যাওয়া সম্পত্তির হিসেব নিতে চাইলে, শম্ভুপদ জানিয়ে দেয় তাদের খোয়া যায়নি কোনো সম্পদ, সুভঙ্গের স্বামী ব্যতীত। গঙ্গামণির কান্না দেখে অফিসার প্রশ্ন করলে শম্ভুপদ জানায়, মেয়েটির স্বামী একটি গাছ, আর সে ঠিক আছে কিন্তু সে তাদের সঙ্গে আসতে পারেনি কেবল। এই বিচ্ছেদের কারণে গঙ্গামণির কান্নাকাটি। উত্তরে অফিসারটি জানান, একদিন শীঘ্রই দলবদল হবে। ঘরবাড়ি তখন ফিরে পেতে পারবে তারা। আর গঙ্গামণিও ফিরে পাবে তার স্বামী-গাছকে, যে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। এটাই গাছ গল্পের সারবস্তু। শিরোনামের ভিত্তিতে গল্পটি আলোচনা করতে গেলে প্রথমে এসে যায় কয়েকটি প্রশ্ন।

এক. গঙ্গামণি কে?
দুই. গঙ্গামণির প্রেম কি বিবাহের চেয়ে বড়?
তিন. গঙ্গামণির প্রেম কতখানি মেলানকলিক?
চার. বিচ্ছেদ আসলে কোথায়?
পাঁচ. গঙ্গামণিদের যাত্রা ডায়াস্পোরিক জার্নি কেন?

'গাছ' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি গাছ। তাকে কেন্দ্র করে একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে গঙ্গামণির কাহিনী। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে কে এই গঙ্গামণি? গল্পের শেষ অংশ দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, গল্পটি লেখা হয়েছে পোস্ট-পার্টিশন পিরিয়ডকে ভিত্তি করে, যা সূচিত করে দেশভাগোত্তর বেদনা-যন্ত্রণাকে। গল্পকার নিজে দেশ ত্যাগ করেন ১৯১৬ সালে, তেরো বছর বয়সে। 'দেশ' অর্থাৎ জন্মভূমি। পরবর্তীকালে কর্মসূত্রে তিনি আবার জন্মভূমির কাছাকাছি ফিরে যান ময়মনসিংহে, পরে বদলি হন খুলনায় যথাক্রমে ১৯৩৫ সালে ও ১৯৩৭ সালে। আসলে অবিভক্ত বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশ গল্পকারের অবচেতন মনে অবস্থান করছে বিপুল জায়গা জুড়ে। আর মাতৃভূমির প্রতি এই স্নেহ, ভালবাসাই অন্যান্য কাহিনীর ভিড় ঠেলে উঠে আসছে গল্পের মধ্য দিয়ে। মনোজগতে সঞ্চরণশীল দেশের মধ্যে বিভেদ বা ফাটল মন থেকে মেনে নিতে পারেননি গল্পকার। ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গল্পের মধ্যে এসে পড়েছে দেশভাগের যন্ত্রণার কাহিনী। 'সীমান্ত পর্যন্ত তারা পৌঁছুল নিরাপদে' —এই একটা লাইনেই লেখকের বুঝিয়ে দেন সীমান্ত পর্যন্ত যাওয়ার ইতিহাস আসলে কতটা বেদনার, কতটা বিষাদের। যখন সমগ্রতা বিভক্ত হচ্ছে বিভাজনের রাজনীতিতে তখন গল্পকারের আবেগমথিত সুর ধরা পড়েছে তার লেখার মধ্য দিয়ে।

গল্পে গঙ্গমণি মুক, বধির একটি মেয়ে। সমাজের চোখে সে অস্বীকৃত। স্বাভাবিক সুস্থ সমাজ গঙ্গামণিকে স্বীকার করে না কোনোভাবে। আসলে গঙ্গমণি এক বিপন্ন সময়ের সন্তান, এক উত্তাল আবহের প্রজনন। দুর্দশাগ্রস্ত মা যেমন তাঁর সন্তানের স্বাভাবিক প্রসব করতে পারেন না, জন্ম দেন

এক অস্বাভাবিক বিকৃত সন্তানের, ঠিক তেমনি পার্টিশন কেন্দ্রিক ট্রমাটিক পিরিয়ডে দেশমাতৃকাও প্রসব করতে পারেনি সুস্থ-স্বাভাবিক গঙ্গামণিকে। ফলে জন্ম হয়েছে মুক, বধির, অসুস্থ মস্তিস্কের গঙ্গামণি। যেমনটা আমরা দেখতে পাই সেলিনা হোসেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসে। '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের উত্তাল পরিস্থিতিতে রইস-এর মা বুড়ি, রইসকে জন্ম দিয়েছিল বিকলাঙ্গ সন্তান হিসেবে। আসলে সময়ের সাথে সাথে সমাজের ভয়াবহ রূপ তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে 'গাছ' গল্পে আমরা দেখতে পাই, '৪৭ এর অশান্ত, অস্থির ও বিপন্ন সময়ের সন্তান গঙ্গামণি, সেই ভয়ঙ্কর সময়ের প্রতিনিধি। আসলে স্বাধীনতা ও দেশভাগ পরবর্তী কালের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ভঙ্গ মানুষের সন্তান হল গঙ্গমণি। একক গঙ্গামণির মধ্য দিয়ে গল্পকার চেষ্টা করেছেন সমগ্র সমাজের পরিস্থিতিকে তুলে আনবার। 'বোবা-কালা' গঙ্গামণির অসহায়তা আসলে সমকালীন বঙ্গদেশের অবস্থার নামান্তর। অস্থির অবস্থায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি কেউই একটি গাছ ছাড়া। গল্পকার বৃক্ষ বা গাছটির নাম বা শ্রেণি উল্লেখ করেননি সুচতুরভাবেই। একথা জানিয়েছেন, প্রচণ্ড ঝড়ে সমস্ত কিছু, গাছপালা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও, ভেঙে পড়েনি গঙ্গামণির আদরের সেই গাছ। সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে সে যেন বীরপুরুষ, সে যেন মহাবাহু—

> গাছকে জীবনের প্রতীক হিসেবে মানব সভ্যতা হাজার হাজার বছর ধরে গণ্য করেছে। সুইস মনোস্তত্ত্ববিদ কার্ল ইয়ুং স্বপ্নে গাছের আবির্ভাবকে আশ্রয়ের আধার হিসেবে কল্পনা করেছেন। এই গল্পটিতে অচিন্ত্যকুমার গঙ্গামণির জন্য সেই আশ্রয়টুকু নিশ্চিত করেছেন, সেখানে উদ্দেশ্যমূলক কোনো যাদুবাস্তবতা নেই, কিন্তু এক ধরণের মায়াময় যাদু প্রবেশ করেছে গোপনে।[৩]

গল্পে দেখতে পাই, সবাই বলছে যে, গঙ্গামণির নিখাদ ভালোবাসা, ভক্তির কাছে প্রকৃতি পরাজিত। আর তাই গাছটার কোনো ক্ষতি হয়নি, বুক দিয়ে আগলে রাখার জন্য। আসলে গঙ্গামণি যেন প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির সন্তান।

চার.

আলোচনার দ্বিতীয় অংশ প্রেম, বিবাহ এবং যৌবন যাপন। গল্পে মূক, বধির একটি মেয়ের মুখে ভাষা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যে আচরণ গ্রামবাসীরা করেছেন তা কুসংস্কারের একটি অংশমাত্র যার নেই কোনো বাস্তব ভিত্তি। সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিগড়ে বাঁধা। সেই নির্দিষ্ট ভাবনার বাইরে উন্মুক্ত মন অনুপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্যে। শৈশব ও কৈশোরের চাপল্যতা দরুণ একটি গাছের প্রতি প্রবল আকর্ষণ গঙ্গামণির। এটাকে আমরা প্রকৃতি প্রেম বা গাছের প্রতি ভালোবাসা বলতেই পারি কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না গাছের সাথে গঙ্গামণির ঝুটো দাম্পত্য। মূক-বধির মেয়েটির যৌবন সমাগমের খবর পায়নি সে নিজেই। এখবর নজরে এসেছিল সুযোগসন্ধানী মনোরথের।

কেননা, সময় সুযোগ বুঝে গঙ্গামণির ওপর যৌন নিপীড়ন চালাত সে। সেই কথা স্বামী-গাছের কাছে অনুযোগ করে সে—

> ...ওদের ঘরের জানালা দিয়ে আমার ঘরটা দেখা যায়, তাই ও ওদের জানালায় দাঁড়িয়ে আমার ঘরের মধ্যে ইশারা পাঠায়। দপ করে রাগ হয়ে যায়, এমন ইশারা। তুমি যদি দেখ! দেখলে তুমি যে ওর কী করবে তার ঠিক নেই।
>
> কী ইশারা করে!
>
> বলে, রাতে ঘরের দরজা যেন খুলে রাখি, ও আসবে।[৪]

আসলে, সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে নারীর সামাজিক অবস্থান ফুটে উঠেছে এই অংশের মধ্যে দিয়ে। সরল বিশ্বাসে প্রেম-সর্বস্ব গঙ্গামণির কাছে বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছে গাছটি। গাছের সাথে গঙ্গামণির বিবাহোত্তর কালে সবাই অপেক্ষা করে থাকে কবে সেই মূক-বধির মেয়েটির মুখ ফুটবে। শেষ পর্যন্ত সময় আসে ঝড়ের রূপকে। মানুষের প্রবল বিশ্বাসকে টলানো একক গল্পকারের কম্ম নয়, তাই পারেন নি তিনি কিন্তু ব্যর্থও হননি তিনি। গল্পকার কথা বলিয়েছেন গঙ্গামণিকে দিয়ে। তার 'উচ্চারিত ধ্বণি' সবাই শুনেছে কিন্তু 'কথা বলা' শোনেনি কেউই। একটু ব্যাখ্যা করা যাক বিষয়টি। মূক-বধির হওয়ার কারণে কথা না বলতে পারলেও নানাবিধ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে গঙ্গামণি। আর সেই শব্দগুলিকে 'কথা' বলে ভ্রম করেছেন শ্রোতারা। প্রকৃতপক্ষে কোনো কথাই বলতে পারেনি গঙ্গামণি, আর বলতে না পারা স্বাভাবিক।

'গঙ্গামণির বিবাহ' আসলে অসহায় অবস্থায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো। 'গাছ' এখানে বিশ্বাস আর ভরসার প্রতিমূর্তি। সকল পরিস্থিতি যখন জীবন স্রোতের বিপরীতে তখন ভরসার জায়গা প্রকৃতি। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে মানুষ বিশ্বাস হারিয়েছে মানুষের প্রতি। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় প্রতিশ্রুত। গল্পকার এখানে বিশ্বাসের শিলা স্থাপন করলেন গাছের মধ্য দিয়ে। গঙ্গামণির প্রেম ও বিবাহের মধ্য দিয়ে যে আস্থার বীজ গল্পকার বপন করেছেন তার উত্তরণের পথ প্রশস্ত হয়েছে গাছটির মধ্য দিয়ে। সবাক মানুষের থেকে নির্বাক গাছ অনেক বেশি বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে গঙ্গামণির কাছে। এই গাছই হলো মানবতা প্রতিষ্ঠার পথ। সীমান্তের সেই অফিসারটির কথায়—

> আপনি আবার আপনার ঘরবাড়ির দখল পাবেন। ফিরে পাবেন স্বামীকে। দেখবেন সে ঠিক আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে বাড়ি আগলে।[৫]

কিংবা—

> সে যেমন আছে তেমনই থাকবে। তাকে কেউ মারবার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাববে না। সে আপনার জন্য প্রতীক্ষা করবে। আবার একদিন দেখা হবে আপনাদের।[৬]

আসলে ধ্বংসের উল্লাস যতই বৃহত্তর হোক না কেন, তার ফাটলেই সুপ্ত থাকে বিশ্বাসের বীজ। আর তারই দৃষ্টান্ত হল গাছটি। অসম প্রেম, বিবাহ এবং যৌন নিপীড়নের উর্দ্ধে সংবেদনশীল মনোসঞ্চালনের ছবির সাক্ষ্য বহন করে 'গাছ' গল্পটি।

পাঁচ.

'গাছ' গল্পটির বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে, তৃতীয় প্রশ্ন ছিল গঙ্গামণির প্রেম কতখানি মেলাঙ্কলিক? গঙ্গামণির প্রেম কতখানি মেলাঙ্কলিক সে বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বেই অবগত হয়েছি গঙ্গমণি নিজেই সুস্থ-স্বাভাবিক এক সমাজে নিঃসঙ্গ। তার ভাষা নেই, আছে শুধু ভাবপ্রকাশ ব্যঞ্জক আকার-ইঙ্গিত, ইশারা অর্থহীন কিছু শব্দ। তার দুর্বলতার সুযোগে সমাজ তাকে রাখতে চায় 'একঘরে' করে। এমনকি সমাজের চোখে সেখানে একটা ব্রাত্যও বটে। গঙ্গামণির 'সই' হিসেবে সুভঙ্গকে গল্পকার উপস্থিত করলেও সুভঙ্গ কখনো তার মনের ভাব বুঝে উঠতে পারেনি সম্পূর্ণভাবে। 'সই' হওয়ার কারণে অন্যদের থেকে সুভঙ্গ গঙ্গামণির মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে কিছুটা। আসলে গল্পকার সুভঙ্গ চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। গঙ্গামণির মূক-বধির ছবিকে সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এক সুস্থ স্বাভাবিক নারী চরিত্রের। কেননা তুলনার মধ্য দিয়েই উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন গল্পকার যে কারণে এখানে উপমান সুভঙ্গ এবং উপমেয় গঙ্গামণি। এদিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে গঙ্গামণি আসলে গল্পের নিঃসঙ্গ এক চরিত্র। সুভঙ্গ সমাজের আর পাঁচজন কমোনারের মতো স্বামীসঙ্গ লাভের মধ্য দিয়ে পেয়েছে সুখ ও তৃপ্তি। যখন প্রবল ঝড়ে মানুষের চিৎকারে চারিদিকে বিদীর্ণ হচ্ছে প্রকৃতি পরিবেশ, তখন—

> সুভঙ্গবালা মনোরথকে খুব জোরে আঁকড়ে ধরেছে; 'ভীষণ ভয় করছে'।
> 'চোখ বুজে থাকো'। মনোরথ বলল অস্ফুটে।
> 'কী হবে?'
> 'মরতে হলে একসঙ্গে মরব। কথা বোলো না'।[৭]

কিংবা গঙ্গামণির খোঁজে যখন দেবুবালা সুভঙ্গবালার ঘরে উপস্থিত হয়, তখন তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছিল একরাশ উৎকণ্ঠা। স্বামী মনোরথের বিষয়ে ভীষণ চিন্তান্বিত ছিল সে। সেই ঝড়ের রাতে গঙ্গামণির মা'কে সে জানিয়েছে—

> '...ঘরে লোক কে?'
> 'তোমাদের জামাই'। দরজার ফাঁকটা কমিয়ে আনল সুভঙ্গ। গলার স্বরও বুঝি নামিয়ে আনলো সঙ্গে সঙ্গে: 'ভাগ্যিস বেলাবেলি চলে এসেছিল। নইলে এ সময়ে নদীতে থাকলে, রাস্তায় থাকলে কী হত কে জানে'।[৮]

এই উৎকণ্ঠা একজন স্বাভাবিক নারীর। এক্ষেত্রে অন্যদের থেকে একটু ভিন্নধরনের গঙ্গামণি।

সুভঙ্গের মতো স্বামী সুখ পায় নি সে। বরং বাগানের মধ্যস্থিত গাছকে আঁকড়ে ধরে সে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছিল মাত্র বিপর্যয়ের হাত থেকে। সে স্বামী-গাছের সাথে একাত্ম হয়ে বিপদে-আপদে তার পাশে দাড়িয়ে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করছিল বিশ্বাসের, আস্থার। গাছ এবং গঙ্গামণির মধ্যে যদি ভিন্ন ধরনের প্রেম থেকেই থাকে, তবে বলতে হয় এ ঘটনা সে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

মনোরথ গল্পের চরম বাস্তব চরিত্র যার অ্যান্টিসিপেটিং পাওয়ার ছিল সর্বোচ্চ। এই মনোরথ গাছ এবং গঙ্গামণির মাঝখানে প্রেমের প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। সে ভালোভাবেই জানত যে প্রাচীন রিচুয়াল অনুযায়ী গাছের সাথে গঙ্গামণির বিবাহের মাধ্যমে মূক, বধির অবস্থা কাটিয়ে ওঠা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই কারণে সে বারবার যৌন নিপীড়নের চেষ্টা করেছে গঙ্গামণির উপর। তার মনোজগতে বিস্তৃত গাছের ডাল ভেঙ্গে নেওয়া, ডাল কেটে ফেলা বা সম্পূর্ণ গাছ কেটে ফেলার মতো দুর্বুদ্ধি জেগে উঠেছে মনোরথের মনে। যদি মূক বধির অবস্থা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে সর্বাগ্রে বিপদে পড়ার সম্ভাবনাও বেশি ছিল মনোরথের। তাই বলা যেতে পারে মনোরথের এই আচরণ গঙ্গামণির নিঃসঙ্গতাকে বাড়িয়ে তুলেছিল আরও। বৃহত্তর সমাজের মধ্যে থেকেও একটা নির্দিষ্ট ক্ষুদ্রতর সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল একক গঙ্গামণিকে কেন্দ্র করে।

প্রেম ও প্রেমের অনুভূতি গ্রহণের ক্ষেত্রেও গঙ্গামণি একাকী। তার স্বামী-গাছের কাছে অনুযোগ, বেদনা ইত্যাদি সমস্ত সেনসিটিভ ফিলিংস-এর ভাষা তার একার কাছে বোধগম্য। বুঝতে চায় না বা বুঝেও না অন্য কেউ। ফলে তার নিঃসঙ্গতার একমাত্র সঙ্গী হয় গাছ। তার প্রেমের পরতে পরতে ধ্বনিত হয় মেলাঙ্কলিক সুর, যা চেনা ছন্দের বাইরে এবং চেনা বৃত্তের বাইরে।

ছয়.

গঙ্গামণির নিঃসঙ্গতার সুর বা একাকিত্বের সুর বারবার ধ্বনিত হয়েছে ‘গাছ’ গল্প জুড়ে। অন্যদের থেকে একটু অস্বাভাবিক বলে তার যেন বিচ্যুতি ঘটেছে সমাজ থেকে। সমাজের চোখে সে যেন অপাঙক্তেয়, সে যেন ব্রাত্য। ‘গাছ’ গল্পে গঙ্গামণি, সুভঙ্গ, মনোরথ প্রত্যেকেই এক একটি বিষয়ের প্রতিনিধি। গ্রামবাসীদের অন্ধবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে বিবাহ কার্য সমাপন হয় গাছ ও গঙ্গামণির মধ্যে। এই ঘটনার দ্বারা মূল সমাজের স্রোত থেকে প্রথমবার বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয় গঙ্গামণিকে। অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়ায় সাধারণের মতো আচরণ করলেও মনোজগতের দিক থেকে সে ভিন্ন। সে যে অন্যদের থেকে আলাদা একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয় এই বিচ্ছিন্নতার নীতি দ্বারা।

যদিও বিবাহ সমাধা হলো গাছের সাথে, তখনো স্বামী-স্ত্রীর মতো একসঙ্গে বাসস্থান সম্ভবপর হয় না তাদের। সে ক্ষেত্রে স্থানু উদ্ভিদ ও জঙ্গম মানুষ কখনোই পারেনা একত্রে বসবাস করতে। ফলে

এখানেও একটা বিচ্ছিন্নতার রেশ থেকেই যায় যা পাঁচজন কমোনার পারে তা পারে না গঙ্গামণি। গল্পে আরো দেখা যায় গঙ্গামণির পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় তার মুখ ফুটলে নতুন করে বিয়ে দেওয়া হবে তার। যদিও এ বিষয়টি কতটা সুদুরপ্রসারী সেই বিষয়ে প্রশ্ন আসতেই পারে কিন্তু বিচ্ছেদের যে একটা প্রয়াস তলে তলে চলছিল সে কথা অস্বীকার করতে পারি না আমরা।

বিচ্ছেদ সর্বদাই বেদনার ও যন্ত্রণার। কাছের মানুষ বা প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদের বেদনা বড় বাজে বুকে। আর সেই কারণেই গঙ্গামণির হৃদয়ও কিছুটা রিক্ত। গল্পে প্রথম যে ঝড়ের উল্লেখ করা হয় সে ঝড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে গল্পকার উল্লেখ করেন তার আগেই আরেকটা ঝড় উঠলো। এই ঝড় মনুষ্যকৃত ঝড়। এই ঝড় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ঝড়। এই ঝড় রক্তক্ষয়ী, ভাতৃহত্যার ঝড়। এই ঝড়ে মৃত্যু ঘটে মনুষ্যত্বের। মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয় বাস্তু ভূমি থেকে। বাস্তুচ্যুত মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় অজানার উদ্দেশ্যে। স্বভূমি থেকে বা জন্মভূমি থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় তাদের। শম্ভুপদ আর দেবুবালা সহ অন্যান্য সবাইকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য গ্রাম ছেড়ে পাড়ি দিতে হয় শান্তির নীড়ের উদ্দেশ্যে। সাত পুরুষের জন্মভিটা মুহূর্তের মধ্যে অচেনা হয়ে ওঠে তাদের কাছে। জীবন টিকিয়ে রাখতে জন্মভূমিকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাদের। বিচ্ছেদের অভিসম্পাত নেমে আসে জন্মভূমি আর মানুষ গুলোর ওপর। হিন্দু-মুসলিম এই দাঙ্গার ফলে একদিকে মানুষ যেমন তার জন্মভূমি থেকে বিচ্যুত হচ্ছে ঠিক তেমনি গল্পকার দেখিয়েছেন গঙ্গামণি ও তার স্বামী-গাছ এর কাছ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে দুইভাবে। এক. আত্মিক সম্পর্কের জায়গা থেকে। দুই. পারস্পরিক সহাবস্থানের সখ্যতা থেকে। দেখা যায় গাছ তার জড়ত্বের কারণে অবস্থান চ্যুত হয়না সে। অপরদিকে সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্ন বাবা-মা তাকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দেয় এক অচেনা অজানা জগতে। এভাবেই তারা উপস্থিত হয় সীমান্তে। এই 'সীমান্ত' শব্দটার উপর যদি আমরা আতস কাচ বসাই তাহলে দেখতে পাব শব্দটার ব্যাখ্যা বহুমুখী। হতে পারে সে 'সীমান্ত' সম্পর্কের সীমান্ত কিংবা জন্মভূমির সঙ্গে যোগাযোগ এর শেষ অংশ কিংবা গাছ ও গঙ্গামণির মধ্যকার প্রেম সূত্রের শেষ অংশ। যদি আমরা দেখি এই সীমান্ত যদি জন্মভূমির সঙ্গে শেষ অংশ হয়, তাহলে খেয়াল করবো সীমান্তে পৌঁছেছে মানুষজন। অর্থাৎ একটা দাঙ্গা সমস্ত গ্রামকে উৎখাত করে ফেলছে তার শিকড় থেকে। তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা যে প্রবল সে বিষয়েও কোনো নিশ্চিত খবর জানেন না গল্পকার, কেবল আভাস দিয়েছেন একটা সংসারের ফিরতে পারে হয়তো। এই বিচ্ছেদ জন্মভূমি থেকে অর্থাৎ যে নাড়ির টান ছিল তা ছিন্ন হতে বসেছে সীমান্তে উপনীত হওয়ার পর। আবার দেখা যায় যে সকল মানুষ সীমান্তে উপনীত, তারা হয়তো জীবনের শেষ সীমান্তে এসে উপস্থিত কিনা কেই বা বলতে পারে। কেই বা বলতে পারে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার রক্তস্রোতে বইবে না তাদের রক্ত। অর্থাৎ তারাও মানবতা বিদ্বেষী এই স্বার্থলোভী দাঙ্গায় প্রাণ হারাতে পারে, জীবনের

কাছে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে তাদের বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ এ যেন ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুডের শেষ সীমান্ত। অন্যদিকে শম্ভুপদ ও তার গ্রামবাসীদের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থানকালীন যে সখ্যতা তৈরি হয়েছিল সেই সখ্যতা থেকেও বিচ্ছেদের একটা ভয় প্রবাহিত হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। এরপর হয়তো নতুন কোনো জীবন সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতে পারে অর্থাৎ এই বিচ্ছেদ শুধুমাত্র জন্মভূমি থেকে বিচ্ছেদ নয় এ বিচ্ছেদ সূচিত করে অনেক কিছু।

আবার গঙ্গামণি এবং গাছের যে বিবাহ হয়েছিল সেই সম্পর্কের পরিণতি হওয়ার পূর্বেই গঙ্গামণি সরে আসতে থাকে তার স্বামীর কাছ থেকে। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সর্বদাই ব্যর্থ গঙ্গামণির জীবনে এক নতুন করে সমস্যার উদ্ভব হয় স্বামীকে ছেড়ে থাকার প্রসঙ্গে। মনেপ্রাণে সে গাছটির সঙ্গে সহাবস্থান করতে চাইলেও পরিবার এবং সমাজ তাকে বারবার 'অসুস্থ মস্তিষ্কের' বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরিয়ে দিয়েছে তার স্বামীর কাছ থেকে। এ সকল বেদনা বা কষ্টকে সহ্য করলেও সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছি যখন সে বুঝতে পেরেছে তার স্বামীর কাছ থেকে তাকে চলে যেতে হবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন স্থানে যেখানে তাকে থাকতে হবে স্বামী-সোহাগ ছাড়াই। ফলে, তাহার অন্তরাত্মা ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠেছে। আসলে গঙ্গামণির জীবনে এই বিচ্ছেদ ব্যথা-বেদনা তার দুই প্রকার। এক. জন্মভূমি বা মাতৃভূমি ছেড়ে আসার বেদনা। দুই. স্বামীকে ছেড়ে আসার বেদনা। এই যন্ত্রণা বেদনা তাকে ভারাতুর করে তুলেছে সীমান্তে পৌঁছবার পরেও। এই বিচ্ছেদ তাকে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দেবে কিনা জানে না সে কিন্তু সীমান্তের অফিসারটির দেওয়া আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়েছে যে সে একদিন ফিরে আসতে পারবে এবং তার স্বামীর কাছে সে সোহাগের দাবি জানাতে পারবে আর বিচ্ছেদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে মিলনের সুরভী মেখে নিতে পারবে জীবনের পরতে পরতে। অর্থাৎ সীমান্তে উপনীত মানুষগুলোর জীবনে 'বিচ্ছেদ' আপতিত হয়েছে এভাবেই এক বৃহত্তর অর্থে।

সাত.

শম্ভুপদ তার গ্রামের সবাই এক এক করে যাত্রা শুরু করে 'দ্বিতীয় ঝড়' ওঠার সাথে সাথেই। 'দ্বিতীয় ঝড়' আসলে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা সে কথা বহু পূর্বেই বলা হয়েছে বারবার। এই ঝড় থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে তারা পাড়ি দিয়েছে এক অজানা গন্তব্যের দিকে। এই উদ্দেশ্যমুখী যাত্রা হল 'ডায়াস্পোরা' বা 'অভিবাসন'। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে মানুষ কখন এই অভিবাসন যাত্রা করে? ঐতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ জীবন-জীবিকার তাগিদে, ভালভাবে বাঁচার স্বপ্নে, আসন্ন সংকট মোকাবেলার উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে অভিবাসনকে। এই আসন্ন সংকট মোকাবিলার উপায় হিসেবে গ্রাম ছাড়তে হয়েছে শম্ভুপদ ও তার সঙ্গী সাথীদের। এই অভিবাসনের আরেকটি প্রতিশব্দ হলো 'মাইগ্রেশন'। ইন্টারনেট থেকে পাওয়া একটি ছক নিচে দেওয়া হল আলোচনার সুবিধারথে।

এই মাইগ্রেশনকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি ইন্টার্নাল অর এক্সটার্নাল অর্থাৎ একটি অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয়। আমরা আলোচনা করব এক্সটার্নাল মাইগ্রেশন বা বহির্দেশীয় অভিবাসন নিয়ে। এই প্রকার অভিবাসন মূলত তিন ধরনের। নাগরিকত্ব সহ অন্য দেশের বাসিন্দা হয়ে যাওয়া, শ্রমিক হিসেবে কোন দেশের অভিবাসী হওয়া এবং সীমান্ত বা বর্ডার অতিক্রম করা শরণার্থী হিসেবে। আলোচ্য গাছ গল্পে আমরা দেখব শম্ভুপদ সহ অন্যান্য অভিযাত্রীরা অস্তিত্ব বাঁচাতে বর্ডার অতিক্রম করতে চায় তৃতীয় প্রকার বহির্দেশীয় অভিবাসন নিয়ে। গল্পের সূত্র ধরে বুঝতে অসুবিধে হয়না গঙ্গামণি ও আর বাকিরা কালের নিয়মে ইতিহাসের পেটে চলে যেতে পারে উদ্বাস্তু হিসেবে। কেননা সর্বদাই ব্যর্থ পরিহাস শোনায় শান্তির ললিত বাণী। জরু-জেওর শুধুমাত্র নয় সম্মান এবং অস্তিত্ব বাঁচানোর দায় তাদের বাধ্য করে অভিবাসন যাত্রায়। নতুন পরিবেশ তাদের

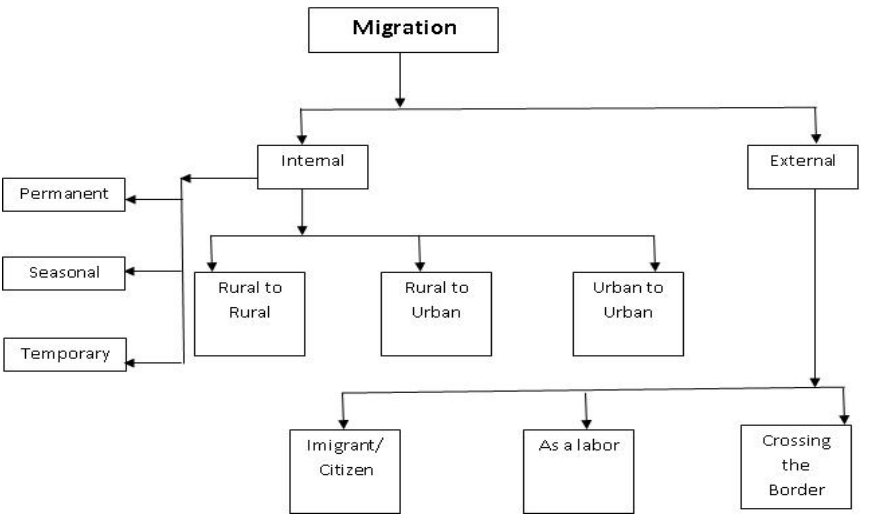

কতখানি আপন করে তা দেখার।

আট.

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘গাছ’ গল্পটিকে অনেকে একটি অভূতপূর্ব অচিন্তনীয় গল্প হিসেবে দাবি করতে পারেন, আবার এক মূক বধির মেয়েকে ভাষা দেওয়ার চেষ্টায় এক ভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা বলতেই পারেন গল্পটিকে কিন্তু গল্পটি পশ্চাতে লুকিয়ে আছে স্বাধীনতা পরবর্তী কালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ইতিবৃত্তের বেদনাসিক্ত ঘটনা এবং উদ্বাস্তু হতে যাওয়া মানুষদের বেদনাঘন জীবনের পশ্চাদপট। সমালোচক দীপেন ভট্টাচার্যের কথায়—

> অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একটি আবিষ্কার। এমন আবিষ্কার যা বোমার মতো, তার বিস্ফোরণে হতচকিত হয়ে পৃথিবীটাকে নতুন করে দেখতে হয়। যেমন ‘গাছ’ গল্পটিকেই

> ধরুন, জড়বুদ্ধি ও মূক মেয়ে গঙ্গামণি এক প্রবল ঝড়ের সময় একটি গাছকে জড়িয়ে ধরে বাঁচে, কিছুক্ষণের জন্য ভাষা ফিরে পায় এবং গাছটিকে স্বামী হিসেবে কল্পনা করে। ....অচিন্ত্যকুমার ভাষা দিচ্ছেন, অনুভব দিচ্ছেন এই মূকজগৎকে। গাছটি যে কী সেটা তিনি উল্লেখ করেন নি, গাছের নামাকরণকে উপেক্ষা করে এক বিমূর্ততা সৃষ্টি করেছেন তা যেন গাছটিকে প্রাণ দিয়েছে। একটি প্রাকৃতিক ঝড় দিয়ে কাহিনী শুরু করেছেন, আর একটি দাঙ্গার ঝড় দিয়ে শেষ করেছেন, কিন্তু দুটির বর্ণনাতে আধিক্য দেন নি, মেল ট্রেনের মত চলেছেন।[৯]

এই বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ করা যেতেই পারে কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে গল্পের অভ্যন্তরে যে দেশভাগ পরবর্তী সময়ের বেদনা ও যন্ত্রণার আলেখ্য গল্পকার অস্পষ্ট ভাবে লিখেছেন তা বড়োই বেদনার। গল্পকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে যেমন পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন মনি এই গল্পে প্রেক্ষাপটকে উপজীব্য রেখে গল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তিনি তার সাবলীলতা দেখিয়েছেন একথা মানতেই হয় পাঠককে। সমালোচক ভূদেব চৌধুরী বলেন—

> অচিন্ত্যকুমারের পরিণত ছোটগল্পে কবিকর্মের প্রাচুর্য থাকলেও গল্পত্বের অভাব ঘটেনি কখনো। তার মুখ্য কারণ শিল্পীর জীবন অভিজ্ঞতার পুঞ্জিত সঞ্চয়।[১০]

অন্যান্য গল্পকারদের থেকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্বকীয়তা অনেক বেশি। গল্পের আকার বা ফর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা, সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে সতর্কতা, ভাষাবাহন সম্পর্কে সচেতনতা, ইত্যাদি সমস্ত কিছু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটোগল্পের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় অনায়াসেই। সে কারণেই হয়তো গল্পকারের সৃষ্টিশীল রচনা শক্তি ক্লান্তিহীন।[১১]

যদি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে কল্লোলীয় গোষ্ঠী ও অন্যান্য লেখক গোষ্ঠীর সাথে একাত্ম করে দেখা হয় তাহলে ভুল হবে কিঞ্চিৎ। কেননা রবীন্দ্র উপন্যাসের কামনার তপ্তশ্বাস মাঝে মাঝে থাকলেও তাকে নানাভাবে অন্যপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সামাজিক ভাবে অঙ্গুলিহেলনের দ্বারা। এই সমস্যার মূল আরো গভীরে প্রোথিত, যেখানে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা প্রধান কারণ হলো সমাজ। তাই দেহ ক্ষুধা ও মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির অতৃপ্তি বোধের ছবি তিনি হাজির করেছেন তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার মধ্য দিয়ে এবং তার পাশাপাশি তিনি নিজের বক্তব্য এক নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে এনে, তৈরি করেন নিজস্ব কল্পনার জাল, ভাবনার জাল। এই ভাবনার পেছনে অনেকাংশে হাত রয়েছে গল্পকারের স্বয়ং। জীবনে করণীয় কাজের সংখ্যা বহু। কিন্তু বিভেদ বিচ্ছিন্নতাবাদের সীমা, রাজনৈতিক সুবিধাবাদের সাথে সাথে এগিয়ে এসে সেই করনীয় কাজ রেখে দেয় অপূর্ণ হিসেবেই। ফলে এই ফাঁদে শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষদের। আর তাদের গল্পই বারবার করে উঠে আসে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখনীর মধ্য দিয়ে।

নানাবিধ গল্পের মধ্যে তাঁর অনেক গল্পই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে কিন্তু পোস্ট পার্টিশন কালের গল্প হিসেবে 'গাছ' গল্পটি সমালোচকদের নজর কীভাবে এড়িয়ে গেল তা বিস্ময়কর।

গল্পকারের মনোজগতের বেঁচে থাকা অবিভক্ত বঙ্গ দেশ এখানে নেপথ্যে থেকে গেছে, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে। ফিরে আসবার বিশ্বাসে ঝড় কাটিয়ে উঠে মানুষগুলোর অনির্দিষ্ট যাত্রা কোথায় থামবে, কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কিনা প্রশ্ন গুলো থেকে যায় প্রশ্ন হয়েই। চোখের জলে বিদায় জানাতে জানাতে যারা এগিয়ে গেল তারা সুখে থাক, মানুষের প্রতি আস্থা রাখুক এমন কামনাই জেগে ওঠে পাঠকের মনে। সময় না হয় উত্তর দেবে কোন একদিন।

তথ্যসূত্র :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ২০শে মে, ২০০০, পৃ. ২-৩

২। রায়, সবিতেন্দ্রনাথ, (সম্পা.), পরিশিষ্ট, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শতবার্ষিকী সংকলন*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৫৩

৩। ভট্টাচার্য, দীপেন, 'অচিন্তনীয় অচিন্ত্য', *গল্পপাঠ ওয়েব-ম্যাগাজিন*, মঙ্গলবার, ১ জানুয়ারী, ২০১৯,

লিঙ্ক : https://www.galpopath.com/2019/01/blog-post_71.html?m=1

৪। সেনগুপ্ত, অচ্যিন্তকুমার, 'গাছ', *একশো এক গল্প*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - অগ্রহায়ণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০

৫। ঐ, পৃ. ৫২

৬। ঐ, পৃ. ৫২

৭। ঐ, পৃ. ৪৫

৮। ঐ, পৃ. ৪৫

৯। ভট্টাচার্য, দীপেন, 'অচিন্তনীয় অচিন্ত্য', *গল্পপাঠ ওয়েব-ম্যাগাজিন*, মঙ্গলবার, ১ জানুয়ারী, ২০১৯,

লিঙ্ক : https://www.galpopath.com/2019/01/blog-post_71.html?m=1

১০। চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার*, মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - ১৯৯৯, পৃ. ৩৪৬

১১। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের পুত্তলিকা*, দে'জ পাবলিশিং, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ - সেপ্টেম্বর, ২০১১, পৃ. ২১৬

চিত্রসূত্র: https://tarekhossain.wordpress.com